১ নীতিবিদ্যার স্বরূপ
[What is Ethics ?]

আমরা কিসের জন্য বাঁচি ? আমাদের বাঁচার কি কোন উদ্দেশ্য আছে ? সভ্য মানুষ এই প্রশ্ন করে কারণ তার কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়েই আমরা বেঁচে থাকি না। শুধু জীবনকে ধারণ করাই বেঁচে থাকা নয়। এ কথার গভীর অর্থ আছে। মানুষ সেই অর্থকে খোঁজে বলেই সে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। শুধু জীবনধারণের মধ্যেই মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না। খাদ্য আমাদের বাঁচায় ; জল, বাতাস আমাদের জীবন রক্ষা করে। কিন্তু এই বাঁচার অর্থ একটি শরীরের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নিছক অস্তিত্বের মধ্যে মানুষ নিজেকে পূর্ণ মনে করে না। মানুষ তার জীবনের অর্থ এবং পূর্ণতাকে খুঁজেছে আদর্শের মধ্যে, মূল্যবোধের মধ্যে। যে জীবন এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সেই জীবন মূল্যহীন, অর্থহীন।

এ কথা বলেছেন অনেক দার্শনিক। অস্তিবাদী এক দার্শনিক বলেছিলেন—আমি এমন একটি সত্যকে চাই যার জন্য আমি বাঁচতে পারি, যার জন্য আমি জীবন দিতে পারি। এই সত্যই তাঁর জীবনের আদর্শ।

আদর্শের জন্য একজন জীবন দিয়েছিলেন। তাঁর নাম সক্রেটিস। এথেন্সের রাজনীতিবিদ এবং বিচারকরা যখন তাঁকে অন্যায় ভাবে কারারুদ্ধ করেন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন তখন বন্ধুদের সহায়তায় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি ও নীতিবোধ তাঁকে এই কাজে উৎসাহিত করেনি। ব্যক্তিগত সুখের আশ্বাসকে উপেক্ষা করে তিনি রাষ্ট্রের আইনের কাছে নতিস্বীকার করেন, যদিও তাঁর ক্ষেত্রে সেই আইনের প্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত হয়নি। এই নতিস্বীকার কার্যতঃ আদর্শের কাছে মাথা নত করা। সক্রেটিস বিশ্বাস করেন যে সৎগুণ (Virtue) নিয়ে বেঁচে থাকাই জীবনের আদর্শ। সেই আদর্শ যদি আমাদের জীবনের আনন্দকে কেড়ে নেয় বা মৃত্যুকে ডেকে আনে তা হলেও সেই আদর্শ নিয়ে সৎ জীবন যাপন করা উচিত। আদর্শনিষ্ঠ জীবনই সার্থক।

সক্রেটিস এইভাবে নীতি বা আদর্শের মধ্যে জীবনের অর্থকে খুঁজেছেন। এই আদর্শের অনুসন্ধান নিয়ে গঠিত হয়েছে 'Ethics' বা 'নীতিবিদ্যা'। অবশ্য সৎ জীবন কাকে বলে সে বিষয়ে নানা মত আছে। উত্তম খাদ্য ও বিলাস কারও কাছে জীবনের আদর্শ ; আবার কেউ নান্দনিক পরিতৃপ্তির মধ্যে জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পায়। কেউ জীবনের অর্থ খুঁজে পায় বিশুদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ জীবনধারণের মধ্যে। নীতিবিদ্যা এই আদর্শের স্বরূপকে জানতে চায় কারণ সেই আদর্শের আলোকেই মানুষের কর্ম অথবা সামগ্রিকভাবে তার জীবনের মূল্যায়ন করতে হবে।

আদর্শ বা মূল্যবোধের ধারণা কবে থেকে মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে তা বলা কঠিন। অনেকের মতে কোন একটি আদর্শের ধারণা মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে সহজাত হয়ে ছিল। মানুষ তার প্রবৃত্তি বশেই কতকগুলি নীতির সাহায্যে তার জীবনকে পরিচালিত করত।

মানুষের বিবর্তনের একটি পর্যায়ে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজ মাত্রই কতকগুলি অনুমোদিত প্রথার দ্বারা পরিচালিত হত। যে সমস্ত প্রথা বা অনুশাসন সমাজকে পরিচালিত করত

তারা নিশ্চয়ই মানুষের নানা প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মানুষের মধ্যে যূথবদ্ধ জীবনযাপনের যে প্রবৃত্তি ছিল, তার মধ্যে যে সহানুভূতির প্রবৃত্তি ছিল, তার উপর ভিত্তি করেই ক্রমশঃ প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতার একটি ধারণার জন্ম হয়। যে কর্মধারা সমগ্র সমাজের কাছে গ্রাহ্য তাই ক্রমশঃ প্রথারূপে সঞ্চিত হয়। এই প্রথাকেই মানুষ তার নৈতিক জীবনের আদর্শ বলে মনে করেছিল।

প্রথাভিত্তিক নৈতিকতা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। ব্যক্তিমানুষ তার আদর্শের রূপকার নয়। তবুও আমরা বলতে পারি যে নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রথানির্ভর বিধির কাছে আত্মসমর্পণ করে মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ বা উন্নতি হয় না।

নৈতিকতার বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে আমরা দেখি যে প্রথার পরিবর্তে মানুষ নিজেই নৈতিকতার নির্ণায়ক হয়েছে। মানুষ তার নৈতিক আদর্শকে খুঁজে পেয়েছে তার বিবেকের মধ্যে। নৈতিকতা যেন তার অন্তরের বাণী। বিবেক যদি সামাজিক প্রথাকে অনুসরণ করতে বলে তা হলেও সেখানে মানুষের নিজস্ব বিচারই প্রধান। এইভাবে নৈতিকতার ধারণা ক্রমশঃ সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতির নির্দেশ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের আপন বিবেকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সক্রেটিস তাঁর জীবনদর্শনকে বিবেকের স্তরেই অনুসন্ধান করেছিলেন।

কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি, সামাজিক প্রথা এবং বিবেকের নির্দেশের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্টতা এবং সর্বজনীনতার অভাব ঘটে। তখনই আমরা নীতিদার্শনিকের শরণাপন্ন হই। সেখানেই সর্বজনীন নৈতিক আদর্শের অনুসন্ধান করা হয়। এই অনুসন্ধানের ফলে 'নীতিবিদ্যা' নামক শাস্ত্রের জন্ম হয়।

Ethics বা নীতিবিদ্যাকে দর্শনের একটি শাখারূপে স্বীকার করা হয়। আমরা কিভাবে মানুষ হিসাবে সৎ হয়ে উঠতে পারি তাই নিয়েই নীতিবিদ্যার আলোচনা। আমাদের আচরণ সৎ হতে পারে, অসৎও হতে পারে। নীতিবিদ্যা একটি আদর্শের আলোকে আমাদের আচরণের মূল্যায়নের চেষ্টা করে।

এ কথা সত্য যে মানুষ কখনই সম্পূর্ণভাবে নীতিজ্ঞান বর্জিত নয়। অধিকাংশ সময়ই মানুষ তার কাজকর্মে নিয়ম অনুসরণ করে। নিজের কাজকে আদর্শনিষ্ঠ করার একটি প্রবণতা মানুষের মধ্যে আছে। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে নীতিবিদ্যার মত একটি শাস্ত্র রচনার কি প্রয়োজন?

আসলে নৈতিকতার বোধ থাকাই সব কথা নয়। নৈতিকতাকে বুঝতে হবে। আমাদের জানতে হবে আমরা কেন এবং কোন্ যুক্তিতে নিয়মানুযায়ী কাজ করি। তার জন্য প্রয়োজন হলে নিজেদের কর্মের নৈতিকতাকে প্রমাণ করতে হবে। কয়েকটি নিয়ম সমাজে প্রচলিত আছে বলেই আমরা তা অনুসরণ করি—এই উত্তরটি নিতান্ত শিশুসুলভ। একজন বুদ্ধিমান মানুষকে জানতে হবে সে কেন একটি নিয়মকে মান্য করে, কারণ প্রয়োজন হলে তাকে হয়ত নিয়মের প্রতিবাদ করতে হয়।

আমাদের নীতিশিক্ষার পদ্ধতিটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আমরা বিশেষ বিশেষ নীতিবাক্য নিয়ে প্রথম নীতিশিক্ষা আরম্ভ করি। "অন্যকে আঘাত কোর না", "তোমার খেলনা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নাও" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নীতিবাক্য শুনতে একজন শিশু অভ্যস্ত। কিন্তু নৈতিক বিধির উৎসকে বা ভিত্তিকে না জানলে নীতিশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমরা বলি "তোমার গুরুজনেরা যা বলেন তা তোমার করা উচিত"। নৈতিক বিধির মূলে আমরা কখনও কখনও

আইনের উল্লেখ করি। আমরা বলি এই কাজটি তোমার করা উচিত কারণ কাজটি আইনসম্মত। কিন্তু এই নৈতিক আদেশের মধ্যেও এ কথা বলা হয়নি যে আমি কেন ঐ সমস্ত বিধি পালন করব। আমরা হয়ত বলব যে কতকগুলি কাজ করা উচিত কারণ তা আমাদের কর্তব্য। এইভাবে নীতিপালনের সপক্ষে আমরা কোন একটি যুক্তি বা ব্যাখ্যা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে নীতিবিদ্যা শুধুমাত্র কতকগুলি 'কর' এবং 'কোর না'র সমষ্টি নয়। নীতিবিদ্যা একটি আদর্শ বা নীতিকে আবিষ্কার করে, যা আমাদের কর্তব্যকে নির্ধারণ করে। এই আদর্শের আলোকে আমাদের কর্মের মূল্যায়ন করা হয়।

উপরের আলোচনার পটভূমিতে আমরা এখন নীতিবিদ্যার একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারি। 'নীতিবিদ্যা' শব্দটি "Ethics" এর বাংলা প্রতিশব্দ। 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Ethica' থেকে। 'Ethica' শব্দটি এসেছে আর একটি গ্রীক শব্দ 'Ethos' থেকে। 'Ethos' শব্দটির অর্থ হল রীতি-নীতি, প্রথা বা অভ্যাস। অনেকে 'Ethics' এবং 'moral' এই শব্দদুটিকে সমার্থক বলে মনে করেন। 'Moral' একটি ল্যাটিন শব্দ যা 'Mores' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'Mores' শব্দের অর্থও রীতি-নীতি বা অভ্যাস। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত ভাবে বলা চলে যে নীতিবিদ্যা হল মানুষের রীতি-নীতি, প্রথা ও অভ্যাস সম্পর্কিত আলোচনা।

Ethics এবং Ethos :

'Ethics' শব্দটির মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রতি ইঙ্গিত আছে। ব্যক্তির চরিত্রই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তবে ব্যাপক অর্থে নীতিবিদ্যা সমাজের সামগ্রিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করে। সমাজের এই সামগ্রিক চরিত্রকে এখনও "Ethos" বলা হয়। সুতরাং নীতিবিদ্যা Ethos বা সমাজের চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তির যোগের কথা আলোচনা করে। যে সামাজিক নীতি আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে নীতিবিদ্যা তাকেই জানার চেষ্টা করে। নীতিবিদ্যা বিশেষ ভাবে সমাজের সেই সমস্ত মৌলিক নীতিকে জানতে চায় যাকে আমরা Morality বা নৈতিকতা বলে উল্লেখ করি।

নীতিবিদ্যা ও সামাজিক প্রথার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে লক্ষ্য করলে মনে হতে পারে যে নৈতিকতা সামাজিক প্রথার অতিরিক্ত কিছু নয়। একদিকে এ কথা সত্য যে নীতিবিদ্যা এবং নৈতিকতা সমাজের আইন এবং প্রথার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু এ কথাও সত্য যে সমাজের সমস্ত আইন বা প্রথাই সমানভাবে গ্রাহ্য নয়। সমাজে প্রচলিত অনেক নিয়মই শুধুমাত্র আঞ্চলিক রুচি এবং প্রথার পরিচয় দেয়। তবে অনেক প্রথারই সর্বজনীন স্বীকৃতি আছে এ কথাও সত্য।

একদিক থেকে নৈতিক নিয়মাবলীকে সমাজের প্রচলিত প্রথা থেকে ভিন্ন বলে মনে হয় কারণ নৈতিক নিয়ম কোন বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নৈতিক নিয়ম সর্বদা এবং সর্বত্র মানুষের উপর প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু সামাজিক প্রথার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এ কথা সত্য যে কিছু কিছু সামাজিক প্রথা নিছক সংস্কার বা কুসংস্কার নয়। তাদের সর্বজনীন সামাজিক গুরুত্বকে আমরা হয়ত অস্বীকার করতে পারি না। নৈতিকতা হয়ত অনেক প্রথার ভিত্তি যা সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং যে প্রথা ভঙ্গ করলে সামাজিক বিপর্যয় হয়। সত্য কথা বলা অথবা প্রতিজ্ঞাপালন করার সামাজিক প্রথার যে নৈতিক ভিত্তি আছে তা অনেকেই

লক্ষ্য করতে পারে। কিন্তু বেশভূষা বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় আহার গ্রহণ করার প্রথার মধ্যে আমরা নৈতিকতাকে আবিষ্কার করি না।

সুতরাং বোঝা যায় যে নৈতিকতা শুধুমাত্র প্রথার মধ্যে নিহিত থাকে না। প্রথামাত্রই যে নৈতিক নয় তা একটি সহজ যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। পিতামাতা বৃদ্ধ হলে তাদের হত্যা করা কোন একটি সমাজের স্বীকৃত প্রথা হতে পারে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি ঃ এই প্রথাটি কি নৈতিক? প্রথা সম্বন্ধে যেহেতু নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা যায় তাই বোঝা যায় যে প্রথামাত্রই নৈতিক নয় ; অর্থাৎ প্রথা নৈতিকতার আশ্রয় নয়। আসলে একটি সমাজের মানুষকে সমষ্টিবদ্ধ করার জন্য যে মনোভাব, বিশ্বাস এবং অনুভূতির প্রয়োজন তাকে অবলম্বন করেই একটি সমাজের Ethos বা রীতি-নীতি গড়ে ওঠে। এই রীতি-নীতি বা প্রথা হয়ত আইনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না ; মানুষের অন্তরে এবং মনে, তার প্রত্যাশা, পছন্দ অপছন্দের মধ্যে, তার আশা বা ঘৃণার মধ্যে এই প্রথা নিহিত থাকে। প্রথামাত্রই নৈতিক নিয়মের মাধ্যমে প্রকট হয় না। নৈতিকতা তার তুলনায় অনেক ব্যাপক, অনেক প্রকট ও সর্বজনীন। নৈতিকতা দেশ, সমাজ বা কালে সীমাবদ্ধ নয় বরং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য

নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় এই নৈতিকতা। নীতিদার্শনিকরা নৈতিকতা বা morality--র কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

(১) প্রথমতঃ নৈতিক নিয়ম পরম মূল্যবান। কোন নৈতিক বিধি যখন আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে তখন তার সিদ্ধান্তকে আমরা চূড়ান্ত বলে মনে করি। যে কোন ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কি সে বিষয়ে নৈতিক বিধির নির্দেশই শেষ কথা। আমি ঋণ পরিশোধ করব কিনা এই বিষয়ে আমি চিন্তা করতে পারি যে ঋণের পরিমাণ যেহেতু অল্প তাই এই ঋণ পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু নৈতিক বিধি নির্দেশ দেয় যে ঋণমাত্রই পরিশোধযোগ্য। স্বল্প পরিমাণ ঋণের মধ্যে যে পরিশোধের দায়বদ্ধতা আছে অধিক পরিমাণ ঋণের মধ্যেও সেই একই দায়বদ্ধতা আছে। এইভাবে আমাদের কর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নৈতিক বিধি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে থাকে।

নীতিদর্শনে নৈতিক বিধির গুরুত্বকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নৈতিক বিধি সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন এবং সেইজন্যই তা গুরুত্বপূর্ণ ; অথবা নৈতিক বিধিকে স্বরূপতঃ মূল্যবান বলা যেতে পারে। সমাজকল্যাণের জন্য নৈতিক বিধির গুরুত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়। প্রতিজ্ঞার প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, বরং তার তুলনায় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা যদি ব্যক্তিগতভাবে সুবিধাজনক হয় তা হলে সভ্য সমাজজীবনের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে।

(২) নৈতিক বিধিগুলি সর্বজনীন। নৈতিক বিধিই আমাদের বলে দেয় কোন্ পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। এখানে ব্যক্তির প্রশ্ন অবান্তর। যেমন, নৈতিক বিধি বলে যে ঋণ পরিশোধ করা উচিত। যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই ঋণ পরিশোধ করা উচিত। নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা বা অধীনতাই নৈতিকতার দাবি। পরিস্থিতিনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিনিরপেক্ষতা থাকার জন্যই নৈতিক বিধি সর্বজনীন। নানা ব্যক্তি নানা পরিস্থিতিতে নানা কারণে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নৈতিক বিধি যখন ঋণ পরিশোধ করতে নির্দেশ দেয় তখন তা পরিস্থিতি প্রভৃতির কথা বিবেচনা করে না। সেইজন্যই নৈতিক বিধিকে সর্বজনীন বলা হয়।

নীতিদার্শনিক বলেন যে নৈতিক বিধি এমন একটি আদেশ যা শর্তহীন। এই বিধি যখন ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ কোন শর্তসাপেক্ষ নয়। এই শর্তহীনতার জন্যই নৈতিক বিধি সর্বজনীন। "ঋণ পরিশোধ কর তা না হলে তুমি ভবিষ্যতে ঋণ পাবে না"—এটি নৈতিক বিধির প্রকৃত রূপ নয়। নৈতিক বিধিতে বলা হয় "ঋণ পরিশোধ কর"। যে কোন শর্তই এখানে অবান্তর।

(৩) নৈতিক বিধিকে বুদ্ধিনিষ্ঠ বা যুক্তিনিষ্ঠ বলা হয়। এ কথার অর্থ হল (ক) নৈতিকতা Reason বা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা অনুভূতি নৈতিকতার ভিত্তি নয়। (খ) নৈতিক বিধিকে যুক্তিনির্ভর বলার অর্থ এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অভিমতের কোন স্থান নেই। (গ) নৈতিক বিধি যুক্তিনিষ্ঠ কারণ এই বিধির নির্দেশ যথোচিত।

(৪) মানুষের নৈতিকতাবোধ আত্মকেন্দ্রিক নয়। নৈতিকতার মধ্যে অন্যের স্বার্থও একইরকম মর্যাদা লাভ করে। প্রত্যেক নীতিদার্শনিকের নীতিশিক্ষার মূল কথা এই যে তুমি অন্যের প্রতি এমন আচরণ করতে পার না যা অন্যে তোমার প্রতি করতে পারে না। একজন সৎ ব্যক্তি শুধুই নিজের স্বার্থ বা কল্যাণ চিন্তা করেন না। অন্যের স্বার্থ বা কল্যাণ চিন্তা তাঁর কাছে একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নীতিবোধ আত্মস্বার্থকে অতিক্রম করে যায়। সহানুভূতি এবং পরহিতচিন্তা নৈতিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত আলোচনায় নীতিবিদ্যার একটি সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখন 'নীতিবিদ্যার' একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থিত করে তাকে বিশ্লেষণ করা হবে।

নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা

উইলিয়াম লিলি নীতিবিদ্যার একটি সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। সংজ্ঞাটি এইরকম—

নীতিবিদ্যা হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান—যে বিজ্ঞান আচরণকে উচিত কি অনুচিত, ভাল কি মন্দ বা অনুরূপভাবে বিচার করে।[১]

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে নীতিবিদ্যার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

নীতিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান। যে শাস্ত্র সুসংবদ্ধ জ্ঞানদান করে তাই বিজ্ঞান। কোন বিষয় সম্পর্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞানে থাকে শৃঙ্খলা ও সম্পূর্ণতা। এই বিজ্ঞান দু'প্রকার হতে পারে—বস্তুনিষ্ঠ (positive) এবং আদর্শনিষ্ঠ (normative)।

বস্তু বা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে তাকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। এইভাবে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। এখানে আলোচ্য বিষয়ের মূল্যায়নের কোন প্রশ্ন নেই। উদ্ভিদবিজ্ঞানী যদি একটি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভিদকে বিচার করার চেষ্টা করেন তা হলে তাঁকে আর বিজ্ঞানী বলা যাবে না। অর্থাৎ তিনি যদি উদ্ভিদকে ভাল বা মন্দ, সুন্দর বা কুৎসিত বলেন তা হলে তিনি বিজ্ঞানী হতে পারবেন না।

কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষিত বস্তুকে বর্ণনা করা হয় না, বরং কোন একটি আদর্শ বা মানদণ্ডের সাহায্যে তার বিচার বা মূল্যায়ন করা হয়। এই জাতীয় বিজ্ঞানকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান

১— "We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies—a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way.'—William Lillie—An Introduction to Ethics.

বলা হয়। আদর্শ তিন প্রকার এবং স্বভাবতঃই আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানও তিনপ্রকার—নন্দনতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা। নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্যের একটি আদর্শের আলোকে বস্তুর সৌন্দর্য বিচার করে। যুক্তিবিজ্ঞানের আদর্শ বৈধতা। এই আদর্শের নিরিখে যুক্তিবিজ্ঞান যুক্তির বৈধতা বিচার করে। নীতিবিদ্যার আদর্শ মঙ্গল বা কল্যাণ। এই আদর্শ নিয়ে নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ ও সামগ্রিকভাবে জীবন কল্যাণকর কিনা তা বিচার করে।

সুতরাং নীতিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান তার নিজস্ব আদর্শের আলোকে যাকে বিচার করে তার নাম 'Conduct' বা আচরণ। সহজ কথায় বলা যায় যে নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে। কিন্তু যে কোন আচরণ নীতিবিজ্ঞানের বিচার্য নয়। এমন অনেক আচরণ বা ক্রিয়া আছে যাদের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই জাতীয় ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলা হয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া যেহেতু আমাদের ইচ্ছাকৃত নয় তাই এই জাতীয় ক্রিয়ার কোন দায়িত্ব আমাদের থাকে না। যে ক্রিয়ার জন্য আমার দায়িত্ব নেই সেই কাজকে বিচার করে আমাকে বিচার করা যায় না। নীতিবিদ্যা শুধুমাত্র মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়াকেই বিচার করে যে ক্রিয়া সে অন্যের দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে স্বপরিকল্পিত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সচেতনভাবে সম্পাদন করে। সচেতনভাবে স্বেচ্ছাকৃত এই ক্রিয়ার জন্য আমরা তার কর্তাকে দায়ী করতে পারি। তাই এই ক্রিয়ার নৈতিক মূল্যায়ন অর্থহীন হয় না। কারণ কর্মের মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্তারও মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

নীতিবিদ্যা সম্পর্কে লিলির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে এই শাস্ত্র সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে। সুতরাং নীতিবিদ্যা যে আচরণের মূল্যায়ন করে সেই আচরণের দুটি বৈশিষ্ট্য—(ক) আচরণটি মানুষের আচরণ, যে কোন প্রাণীর ক্রিয়া বা আচরণ নয়। (খ) যে মানুষের আচরণ নীতিবিদ্যার বিচার্য তা সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ। সমাজবহির্ভূত মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করা নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। এই দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

(ক) মনোবিজ্ঞানীদের মতে কেবলমাত্র মানুষের ক্রিয়াই ঐচ্ছিক হতে পারে, এবং সেই কারণেই শুধুমাত্র মানবিক ক্রিয়াই নীতিবিদ্যার বিচার্য হতে পারে। আমাদের নিম্নশ্রেণীর অনেক প্রাণীর মধ্যে কিছু কিছু ক্রিয়া লক্ষ্য করি যা মানুষের আচরণের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়। যেমন, মানুষের মধ্যে যেরকম প্রভুভক্তি দেখা যায় কুকুরের আচরণেও সেইরকম প্রভুভক্তি আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা কুকুরের এই ক্রিয়াকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন। সেইজন্য বলা হয় যে কেবলমাত্র মানুষের ক্রিয়াই নীতিবিদ্যার বিবেচ্য।

(খ) নীতিবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে। এইভাবে নীতিবিদ্যার বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা এসেছে। নীতিবিদ্যা যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে নিজের বিচারকে সীমাবদ্ধ রাখে। এই ঐচ্ছিক ক্রিয়া আবার মানবিক ক্রিয়া, পশুপাখির আপাত ঐচ্ছিক ক্রিয়া নয়। আবার যে কোন মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে নীতিবিদ্যা বিচার করে না। যে মানুষ সামাজিক বা সমাজবদ্ধ শুধু তার ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নীতিবিদ্যার বিচার্য।

এ কথার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সামাজিকতা ছাড়া কোন মানুষ সৎ বা অসৎ কর্ম করতে পারে না। আমার যে কর্ম শুধুই আত্মমুখী, যে কর্মের কোন সামাজিক মূল্য নেই, সেই কর্ম নৈতিক বিচারের যোগ্য নয়। আমার কাজ সমাজের অন্য মানুষকে প্রভাবিত করে এবং আমি অন্যের

কাজের দ্বারা প্রভাবিত হই বলেই সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষের কর্মকে সংযত করতে হয়। নৈতিক আদর্শের দ্বারা, নৈতিকবিচারের দ্বারা নীতিবিদ্যা সমাজের মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে মানুষ একা, সমাজের বাইরে যার অবস্থান তার কর্মকে মূল্যায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

সুতরাং লিলি নীতিবিদ্যার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাকেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। সংজ্ঞাটি এই যে **নীতিবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন মূলক একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।**

একটি দার্শনিক মত অনুযায়ী নীতিবিদ্যা দর্শনেরই একটি শাখা। নীতিবিদ্যা হল নীতিদর্শন যেখানে নৈতিকতা, নৈতিক সমস্যা এবং নৈতিক বিচারসম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা করা হয়। সক্রেটিসের জীবনের শেষ দিনগুলির কথা যদি আমরা বিবেচনা করি তা হলে এ কথার অর্থ বোঝা যাবে। সক্রেটিস রাষ্ট্রের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি কারাগারে বন্দী হন এবং মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে দোষী বলে মনে করে না। তারা সক্রেটিসকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়। এই পরামর্শের সমর্থনে তাদের যুক্তি ছিল এই যে কারাগার থেকে বাইরে এলে সক্রেটিস নির্বিঘ্নে দীর্ঘজীবন উপভোগ করতে পারবেন, তাঁর পরিবারবর্গ সুখে থাকবে। এই প্রসঙ্গে সক্রেটিস তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য নৈতিক বিতর্কের অবতারণা করেন। সাধারণ মানুষের নৈতিক চিন্তাধারাকে বিচার করে তিনি স্থির করেন যে রাষ্ট্রের আইনকে অমান্য করে কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্যায়। আইন অমান্য করে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারবর্গের কোনরকম মঙ্গল করতে পারবেন না। তিনি এইরকম যুক্তি প্রদর্শন করেন যে একজন বৃদ্ধ মানুষ, যে তার সমস্ত কর্তব্যই সম্পাদন করেছে, তার কাছে মৃত্যু কখনও অবাঞ্ছিত হতে পারে না। সুতরাং কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই।

তা ছাড়া সক্রেটিস মনে করেন যে কারাগার থেকে পালিয়ে গেলে রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করা হবে। তার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে। কিন্তু কারও ক্ষতি করা উচিত নয়। তা ছাড়া একজন ব্যক্তি যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের নিয়ম মান্য করার দায়বদ্ধতা সেই ব্যক্তির আছে। সক্রেটিস যদি পালিয়ে যান তা হলে সেই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করা হবে।

এইভাবে নৈতিক সমস্যার দার্শনিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নীতিদর্শনের সূত্রপাত হয়। অনেকে বলেছেন[২] যে এইভাবে প্রচলিত চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে আমরা যখন বিচারমূলক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করি তখন নীতিদর্শনের সূচনা হয়। এই দার্শনিক আলোচনাই নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দর্শনের শাখা বলা হয়েছে।

নীতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা
Different Branches of Ethics

নৈতিকতাকে আমরা বিভিন্নভাবে আলোচনা করতে পারি। এই সমস্ত আলোচনাই যে আদর্শনিষ্ঠ তা নয়। যেমন একজন নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী বা একজন ঐতিহাসিক যে কোন

২. William Frankena

সমাজের নৈতিক বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে তথ্যগত আলোচনা করতে পারে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনামূলক এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা বিভিন্ন সমাজের নৈতিক ধারণা ও নৈতিক বিশ্বাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এইরকম আলোচনার মধ্য দিয়ে যে নীতিবিদ্যার সূচনা হয় তাকে **'বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা'** বা 'descriptive ethics' বলা হয়। বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা এইভাবে বিভিন্ন সমাজকে পরিদর্শন করে বিভিন্ন প্রকার নৈতিক বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণের ইতিহাস সংগ্রহ করে। নীতিদর্শনে এই বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির কোন স্থান নেই এ কথা বলা হয়ত সঙ্গত নয়। কারণ নৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে এই জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করার পরেই আমরা বলতে পারি আমাদের নৈতিক অবধারণগুলি আপেক্ষিক (relative)। বিভিন্ন সমাজে নৈতিক বিশ্বাস এতই বিচিত্র যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে অনেকেই ব্যক্তিসাপেক্ষতা বা সমাজসাপেক্ষতাকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

নৈতিকতার আলোচনা কখনও আদর্শনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের নৈতিক জীবন যে সমস্ত নৈতিক বিধির দ্বারা পরিচালিত হয় নীতিবিদ্যা সেই বিধিগুলি প্রণয়ন করার চেষ্টা করে। তা ছাড়া নীতিবিদ্যা এই নৈতিক সূত্রগুলিকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করে। এইভাবে নীতিবিদ্যার আর একটি শাখার জন্ম হয় যার নাম **'আদর্শমূলক নীতিবিদ্যা'** বা 'normative ethics.'

নীতিবিদ্যার ইতিহাসে আমাদের কর্মের নানারকম আদর্শের কথা বলা হয়েছে এবং সেই আদর্শের দ্বারা আমাদের কর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেমন, একসময় অনেকেই এ কথা বলেছিলেন যে সুখই আমাদের সমস্ত কর্মের আদর্শ। যে কর্ম সুখ উৎপাদন করে সেই কর্মই নীতিগতভাবে ভালো। আবার উপযোগবাদী দার্শনিকরা বলেছিলেন , যে কর্ম সর্বাধিক মানুষের সর্বোত্তম সুখ উৎপাদন করতে পারে তাই আদর্শ কর্ম। এইভাবে নীতিবিদ্যায় মানুষের কর্মের নানাবিধ আদর্শের কথা বলা হয়েছে। এই ভাবে আদর্শমূলক নীতিবিদ্যার জন্ম হয়েছে।

নীতিবিদ্যার অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আর একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। আমরা নৈতিক আলোচনায় কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করি। বিশেষভাবে নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ, দায়বদ্ধতা, সততা ইত্যাদি শব্দ বা ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য। আদর্শমূলক নীতিবিদ্যায় এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা নীতিবিদ্যার এই শাখায় করা হয় না। নৈতিক পদগুলি ব্যাখ্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে নীতিবিদ্যার যে শাখা তাকে **'পরানীতিবিদ্যা'** বা 'metaethics' বলা হয়।

পরানীতিবিদ্যা যে শুধু নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত পদগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে তা নয়। তার আলোচনার পরিধি অনেক বিস্তৃত। পরানীতিবিদ্যা নৈতিক মূল্য (moral value) সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যে এই মূল্য কি বস্তুনিষ্ঠ অথবা ব্যক্তিনিষ্ঠ। নৈতিক মূল্য—যাকে আমরা সহজ ভাষায় 'ভালোত্ব' বা 'goodness' বলি—তাকে অনেকেই আমাদের আচরণগত ধর্ম বলেছেন। আবার অনেকের মতে নৈতিক মূল্য আমাদেরই মধ্যে থাকে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত।

পরানীতিবিদ্যার আরও অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। যেমন আমরা নৈতিক বিচার করি। আমরা বলি এই কাজটি ভাল অথবা ঐ কাজটি খারাপ। এখন এই নৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তি কি? অনেকে বলেছেন যে একটি কাজ সুখ উৎপাদন করেছে এই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি যে কাজটি ভালো বা কাজটির নৈতিক মূল্য আছে। কিন্তু সুখ উৎপাদন করার সঙ্গে

ভালোত্বের কি কোন আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে ? একটি বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা কি যুক্তিসঙ্গত ? এই প্রশ্নও পরানীতিবিদ্যার আলোচ্য।

আরও আধুনিক পর্যায়ে নীতিবিদ্যার আর একটি শাখার জন্ম হয়েছে। তার নাম, 'ফলিত নীতিবিদ্যা' বা 'applied ethics'। অনেক নীতিদার্শনিকের মতে নীতিবিদ্যায় যে আদর্শের কথা বলা হয় তার যদি ব্যবহারিক প্রয়োগ না থাকে তা হলে সেই আদর্শের কোন মূল্য থাকে না। ব্যবহারিক জীবনে আমরা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হই যেমন আত্মহত্যা, কৃপাহত্যা, জাতিগত বৈষম্য, ইত্যাদি তাদের নৈতিক বিচারের দায়িত্ব দার্শনিকদেরই গ্রহণ করতে হবে। আদর্শ যদি শুধু তত্ত্ব হয়ে থাকে এবং তার প্রয়োগ না হয় তা হলে সেই তত্ত্বের কোন মূল্য থাকে না। নৈতিক আদর্শকে তাই ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। এইভাবে চিকিৎসা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, আইন, সাংবাদিকতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ফলিত নীতিবিদ্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয় সেখানে সাধারণ নৈতিক সূত্রকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ব্যবহারিক সমস্যার ক্ষেত্রে নৈতিক সূত্রের প্রয়োগ নীতিবিদ্যাকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করে বলে মনে করা হয়।

নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনা বা মূল্যায়নের ফলে বিভিন্ন ক্রিয়া বা আচরণকে নানা নৈতিক বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করা হয়। আমরা বলি কাজটি ভালো বা মন্দ (good or bad), যথোচিত বা অনুচিত (right or wrong)। এই শব্দগুলিকে নৈতিক বিশেষণ বলা হয়। নীতিবিদ্যা এই বিশেষণগুলির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করে।

ভালো ও মন্দ
Good and Bad

নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে আমরা 'ভালো', 'মন্দ' এই শব্দগুলি ব্যবহার করি। আমরা সেই কাজকেই করা উচিত বলে মনে করি যে কাজ ভালো। যে কাজ মন্দ তা করা উচিত নয়। 'ভালো' ও 'মন্দ' এই শব্দ দুটি বহুল প্রচলিত হলেও এদের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সহজ নয়। শব্দ দুটির লৌকিক ব্যবহার লক্ষ্য করলে এই অস্পষ্টতা বোঝা যাবে। সৎ মানুষের কাজকে আমরা ভালো বলি। একজন দুর্বৃত্ত ধনী ব্যক্তির বাড়ি থেকে যা অপহরণ করেছে, তার পরিমাণ তার কাছে ভালো বলে মনে হতে পারে। আসলে 'good' বা 'ভালো' শব্দটি একটি বস্তু বা ঘটনার প্রতি আমাদের ইতিবাচক বা অনুমোদনমূলক মনোভাবকে বোঝায়।

'ভালো' শব্দটির লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে যে শিথিলতা আছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা তাই এই শব্দটির লৌকিক অর্থ ও নৈতিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য করি। কিন্তু 'ভালো' শব্দটির নৈতিক অর্থও যে যথেষ্ট স্পষ্ট তা বলা যায় না। আমরা কোন্ আচরণকে নৈতিক অর্থে ভালো বলব ? আমরা একটি আচরণকে নৈতিকভাবে ভালো বলি যে আচরণটিকে আমরা অনুমোদন করি। আবার যে কর্ম আমাদের মনে অনুমোদনমূলক মনোভাব জাগ্রত করতে পারে তাকেও আমরা ভালো বলি। মনে হয় যে আমরা যখন কোন কর্মকে ভালো বলি তখন আমরা একটি আদর্শমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি। সেই আদর্শ বা নৈতিক গুণ যে কর্মে প্রকাশিত হয় সেই কর্মই ভালো।

ব্যুৎপত্তি বিচার করে আমরা হয়ত ভালো-মন্দ শব্দ দুটির অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারি। ইংরাজী 'good' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'ভালো'। 'Good' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে জার্মান শব্দ 'Gut' থেকে। এই জার্মান শব্দটির অর্থ হল যা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সুতরাং

ব্যুৎপত্তিগত ভাবে যা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক তাই ভালো (valuable for some end—Mackenzie)। ব্যায়াম করা ভালো কারণ তা সুস্বাস্থ্য লাভের লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের সাহায্য করে। মানুষের একটি কর্মকেও আমরা ভালো বলব যদি তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। এইভাবে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়কেই আমরা ভালো বলি। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা চেষ্টা করি সেই উদ্দেশ্যটি কি ভালো নয়? আসলে সুস্বাস্থ্য লাভের উপায়টি যেমন ভালো তেমন সুস্বাস্থ্যও ভালো। ব্যায়ামের মধ্যে যেমন কল্যাণ আছে সেইরকম সুস্বাস্থ্যের মধ্যেও কল্যাণ আছে। সুতরাং 'ভালো' শব্দটি যেমন উপায়কে (means) বোঝায় সেইরকম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকেও (end) বোঝায়।

তবে ভালো-র এই ধারণার মধ্যে আপেক্ষিকতা আছে। আমরা কোন কিছুকে ভালো বলছি শুধু এইজন্য যে তার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে 'ভালো' বলা হয়। একটি ওষুধ ভালো কারণ তা রোগ নিরাময়ের সহায়ক। রোগের নিরাময় স্বাস্থ্যের সহায়ক। স্বাস্থ্য সুখের সহায়ক। এই ভাবে যা ভালো তা সর্বদাই একটি উদ্দেশ্যকে অপেক্ষা করে। এর সঙ্গে তুলনা করে ভালোর আর একটি ধারণা গঠন করা যায় যাকে 'absolute good' বা নিরপেক্ষভাবে ভালো বলা যাবে। যাকে এই অর্থে ভালো বলা যায় তা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। তা স্বরূপতঃই ভালো। আমরা তাকে কামনা করি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নয়। তাকে পাবার জন্যই আমরা তাকে কামনা করি।

যথোচিত ও অনুচিত
Right and Wrong

যে কাজ নিয়মানুগ বা বিধিসম্মত সেই কাজই যথোচিত। যা নিয়মানুগ নয় বা বিধিসম্মত নয় তাই অনুচিত কাজ। সুতরাং একটি নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতেই 'যথোচিত' এবং 'অনুচিত' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই দুটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এখানে 'ঔচিত্য' বা 'কর্তব্যের' প্রতি ইঙ্গিত আছে। যা উচিত, যা কর্তব্য তাই যথোচিত। এর বিপরীত হল অনুচিত। আমরা বুঝতে পারি যে 'যথোচিত' এবং 'অনুচিত' শব্দদুটি বিশেষভাবে নীতিবিদ্যার শব্দ। আমরা আরও বুঝি যে, যে কোন নিয়ম পালন করাই যথোচিত কাজ নয়। যেখানে আমরা নৈতিক বিধির কথা বলি সেখানে সেই বিধি অনুযায়ী কাজকেই 'যথোচিত' কাজ বলা হবে। যে কাজ এই বিধি ভঙ্গ করবে সেই কাজই অনুচিত।

'যথোচিত' শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল 'right'। এই ইংরাজী শব্দটি এসেছে একটি গ্রীক শব্দ 'rectus' থেকে। 'rectus' এর অর্থ হল 'straight' বা সোজা। এখানে 'সোজা' মানে যা নিয়মকে অনুসরণ করে। এইভাবে ব্যুৎপত্তি বিচার করলে দেখা যায় যে নিয়মানুগ বা বিধিসম্মত কাজই 'যথোচিত' (right)।

আবার 'অনুচিত' শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল 'wrong' যা এসেছে Latin শব্দ 'wring' থেকে। 'wring' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'মোচড়ান'। যা লক্ষ্যভ্রষ্ট, যা বিধিকে মানে না তাই 'wrong' বা অনুচিত। সুতরাং নিয়মবহির্ভূত কাজ মাত্রই অনুচিত।

নীতিবিদ্যা কি বিজ্ঞান?

বিজ্ঞান অবশ্যই এক বিশেষ প্রকারের জ্ঞান। বিজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। 'সাধারণ জ্ঞান' বলতে আমরা সাধারণ মানুষের জ্ঞানকে বুঝি। যে মানুষ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণা গঠন করার জন্য শুধু ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে সেই সাধারণ মানুষ। ইন্দ্রিয়লব্ধ যে জ্ঞান বিনা বিচারে আমাদের দ্বারা গৃহীত হয়, তাই সাধারণ জ্ঞান। এই বিচ্ছিন্ন, বিচারবিযুক্ত, অ-সার্বিক সাধারণ জ্ঞান যখন বিচার-বিশ্লেষণের ফলে সর্বজনস্বীকৃত সার্বিক ও সামগ্রিক সত্যে পরিণত হয় তখন তা 'বিজ্ঞান' নামের যোগ্য হয়।

প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগকে অবলম্বন করে এইভাবে নানা বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। জড়জগতের অন্তর্গত বিভিন্ন পদার্থের প্রকৃতি ও তাদের নিয়ন্ত্রক নিয়ম আবিষ্কার করে পদার্থবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ, তার জীবনচক্র এবং বিবর্তন আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের মনোজগতের বিভিন্ন ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে তার সাধারণ নিয়মাবলী আবিষ্কার করে।

নীতিবিদ্যাকেও একটি বিজ্ঞানরূপে স্বীকার করা যেতে পারে। নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তবুও এখানে আলোচনার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত। এই শাস্ত্রে মানুষের আচরণ এবং তার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুসংবদ্ধ; এর সিদ্ধান্ত সার্বিক ও বিচারনিষ্ঠ। তাই নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা অযৌক্তিক নয়।

নীতিবিদ্যা কিরকম বিজ্ঞান?

বিজ্ঞান হিসাবে নীতিবিদ্যার কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। আমরা আলোচনা পদ্ধতি, বিশ্লেষণধর্মিতা প্রভৃতি লক্ষ্য করে নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনাও বহুমুখী হতে পারে। বিজ্ঞানের চরিত্র নির্ভর করে তার উদ্দেশ্যের উপর। কোন কোন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধুই বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। এই নিষ্ঠাই এই জাতীয় বিজ্ঞানের আসল পরিচয়। পদার্থবিজ্ঞান বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের আলোচনা যদি বস্তুনিষ্ঠ না হয় তা হলে বিজ্ঞান হিসাবে সেই আলোচনা ব্যর্থ। এই জাতীয় বিজ্ঞানকে 'বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান' বা 'Positive Science' বলা হয়। এই জাতীয় বিজ্ঞান বর্ণনামূলক বলে তাদের 'বর্ণনামূলক বিজ্ঞান'ও বলা হয়।

বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের ইতিবাচক পরিচয় হল তার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনামূলক চরিত্র। এর নেতিবাচক চরিত্র হল এই বিজ্ঞানে মূল্যায়নের কোন স্থান নেই। যে পদার্থ যে নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে সেই নিয়ম যথোচিত কিনা এই আলোচনা পদার্থ বিজ্ঞানে স্থান পায় না। কোন উদ্ভিদ ভালো কি মন্দ এই আলোচনাও উদ্ভিদবিজ্ঞানে করা হয় না। তার কারণ এই সমস্ত বিজ্ঞানে মূল্যায়নের অবকাশ নেই।

কোন কোন বিজ্ঞান আবার মূলতঃ মূল্যায়নমূলক। একটি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত বিজ্ঞান তাদের বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে। যে বিজ্ঞান একটি আদর্শের আলোকে তার বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে তাকে 'আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান' (normative science) বলে।

আদর্শ তিন প্রকার হতে পারে—সত্য (truth), শিব (goodness), ও সুন্দর (beauty)। এই তিনটি আদর্শকে অবলম্বন করে তিনটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে—যাদের নাম যথাক্রমে যুক্তিবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা ও নন্দনতত্ত্ব।

মনোবিজ্ঞান একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মানুষ কিভাবে চিন্তা করে—অর্থাৎ মানুষের চিন্তার গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু আমার চিন্তা কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, কোন্ নিয়ম অনুসারে চিন্তা করলে সেই চিন্তা বৈধ বা সত্য হয়ে উঠবে—এই আলোচনা মূল্যায়নমূলক। চিন্তার সত্যতা বা যুক্তির বৈধতা বিচার করার জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। যুক্তিবিজ্ঞান বা Logic এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তার বা যুক্তির বৈধতাকে বিচার করে। যুক্তিবিজ্ঞান তাই একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। সৌন্দর্যের আদর্শকে সামনে রেখে নন্দনতত্ত্বও এইভাবে মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়। তাই নন্দনতত্ত্ব একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

নীতিবিদ্যাও আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের একটি দৃষ্টান্ত। নীতিবিদ্যা আমাদের আচরণকে শুধু বিশ্লেষণ করে না, আমরা কিরূপ আচরণ করি তাকে তথ্যনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করা নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। বরং নীতিবিদ্যা বিচার করে আচরণের নৈতিকতা। কোন্ আচরণ নৈতিক এবং যথোচিত তা বিচার করার জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। নীতিবিদ্যা একটি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে আমাদের আচরণের মূল্যায়ন করে। সুতরাং নীতিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

স্বভাবতঃই নীতিবিদ্যাকে এই মূল্যায়নের জন্য একটি নৈতিক আদর্শ খুঁজে নিতে হয়েছে। আদর্শ আমরাই নির্মাণ করি। তাই নীতিবিদ্যায় নানা দার্শনিক নানাভাবে এই আদর্শকে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সকলেরই মূল উদ্দেশ্য একটিই—মানুষের আচরণের আদর্শনিষ্ঠ বিচার করা। এই আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা তাত্ত্বিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে আমাদের আচরণ ও সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবন কিভাবে নৈতিক হয়ে উঠতে পারে এই নির্দেশ নীতিবিদ্যার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার জন্য নীতিবিদ্যার এই আদর্শনিষ্ঠ তাত্ত্বিক মূল্যায়ন ব্যর্থ হয় না।

নীতিবিদ্যা কি ব্যবহারিক বিজ্ঞান?

নীতিবিজ্ঞান যেহেতু মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান তাই স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে নীতিবিদ্যাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলা যায় কিনা। যে বিজ্ঞান মানুষকে ব্যবহারিক জীবনে পথনির্দেশ করে তাকে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' বা 'Practical Science' বলা হয়। নীতিবিদ্যার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে অনেকেই প্রত্যাশা করেছেন তার কারণ নীতিবিদ্যার মূল বিষয় হল মানুষের আচরণ বা ব্যবহার।

কিন্তু অধিকাংশ নীতিদার্শনিকই নীতিবিদ্যার ব্যবহারিক দিককে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা তত্ত্বের স্তরেই সমাপ্ত হয়। তবে আদর্শগত আলোচনা তাত্ত্বিক হলেও তার একটি প্রয়োগিক দিক থাকতে পারে। একটি নৈতিক মূল্য বা আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে। কিন্তু মূল্যায়নের জন্য আদর্শের প্রয়োগ হলেও এইভাবে নীতিবিদ্যা একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে না। কারণ নীতিবিদ্যা মানুষকে তার ব্যবহারিক জীবনে পরিচালনা করতে চায় না। মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে এই আদর্শকে লাভ করবে তা নীতিবিদ্যা নির্দেশ করে না।

নীতিবিদ্যা মানুষকে বিভিন্ন নৈতিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। আমরা জানতে পারি ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি পদের প্রকৃত অর্থ কি। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে নীতিবিদ্যা মানুষকে সৎপথে বা নৈতিক পথে নিয়ে যায় না। যুক্তিবিদ্যা মানুষকে শেখায় বৈধ ও অবৈধ যুক্তির প্রভেদ, কিন্তু মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ করার চেষ্টা করে না। একই ভাবে নীতিবিদ্যা নৈতিক আদর্শের কথা বলে, কিন্তু তাকে নীতির পথে পরিচালনা করা নীতিবিদ্যার কাজ নয়। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব অনেক। নীতিবিদ্যা আদর্শের দিক থেকে মানুষের বাস্তব আচরণকে দেখে। কিন্তু মানুষকে তার বাস্তবের স্তর থেকে আদর্শের স্তরে উন্নীত হতে শেখায় না। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণকে বিচার করে তত্ত্বে পরিসীমার মধ্যে।

তবে এই মত সমস্ত দার্শনিকের কাছে গ্রাহ্য নয়। অনেকেই মনে করেন যে নৈতিক বাক্যে যেখানে আচরণের মূল্যায়ন করা হয় সেখানেই কিছু ব্যবহারিক নির্দেশ থাকে। 'এই কাজটি ভালো'—এ কথার মধ্যে একটি ব্যবহারিক নির্দেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমরা বলতে চাই এইরকম কাজ তোমার করা উচিত। বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনার নিজস্ব মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু যেহেতু সেই তত্ত্বালোচনার কেন্দ্রে আছে মানুষের আচরণ তাই সেই আচরণ সম্পর্কে কোন নির্দেশ না থাকলে নিছক আদর্শগত আলোচনার মূল্য অনেকটাই হ্রাস পাবে। মনে রাখতে হবে যে যুক্তিবিজ্ঞানের বৈধতার শিক্ষা আমাদের বৈধ যুক্তি প্রয়োগে বাধ্য না করলেও নিজের যুক্তি সম্বন্ধে আত্মসমালোচনার পথ খুলে দেয়। আমরা নিজেদের যুক্তিকে বৈধ করার চেষ্টা করতে পারি। নীতিবিদ্যাও আমাদের প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক হতে বাধ্য করে না ; তবে নৈতিক হতে উদ্বুদ্ধ করে।

সুতরাং আলোচ্য বিতর্কের প্রসঙ্গে আমরা দুটি কথা বলতে পারি—(ক) নীতিবিদ্যা আমাদের আচরণ সম্পর্কে যে আদর্শনিষ্ঠ মন্তব্য করে তার মধ্যে ব্যবহারিক নির্দেশ বা অনুজ্ঞা প্রচ্ছন্ন থাকে ; (খ) নীতিবিদ্যা আমাদের নৈতিক জীবনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে।

আধুনিক যুগে ফলিত নীতিবিদ্যার জন্ম হয়েছে। নীতিবিদ্যার এই শাখা জন্মলাভ করেছে কারণ অনেকে মনে করেছেন যে নীতিবিদ্যার আদর্শ যদি আমাদের জীবন ও তার ব্যবহারিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থাকে তা হলে তা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। চেতনাহীন মানুষের মূল্যহীন জীবনের সমাপ্তি ঘটানো উচিত কিনা, বিত্তবান দেশের পক্ষে দরিদ্র, বুভুক্ষু দেশের মানুষকে সাহায্য করা নৈতিক দিক থেকে আবশ্যক কিনা, অথবা জাতিবৈষম্য অব্যাহত রাখা সঙ্গত কিনা—এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা তো নীতিদার্শনিকের অভিমতের জন্যই অপেক্ষা করব। নীতিবিদ্যা যদি তার আলোচনাকে তত্ত্বের স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখে তা হলে তা অপূর্ণ হয়ে থাকবে।

প্রশ্নাবলী

১। নীতিবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
২। রত্ননিষ্ঠ ও আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি ? নীতিবিদ্যা কি আদর্শনিষ্ঠ শাস্ত্র ?
৩। নীতিবিদ্যা সম্পর্কে লিলির সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ কর।
৪। নীতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখাগুলি বর্ণনা কর।
৫। 'ভালো' ও 'মন্দ', 'যথোচিত' ও 'অনুচিত'—এই ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর।
৬। নীতিবিদ্যাকে তুমি কি প্রকার বিজ্ঞান বলে মনে কর ?

৭। তুমি কি নীতিবিদ্যাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলে মনে কর ?

৮। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**

ক) নৈতিক নিয়ম কি সার্বজনীন ?

খ) নীতিবিদ্যা কি একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান ?

গ) নীতিবিদ্যা কি একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান ?

ঘ) নীতিবিদ্যা আমাদের কি জাতীয় আচরণের মূল্যায়ন করে ?

ঙ) নীতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখার নাম কি ?

চ) একটি কর্ম নৈতিকভাবে ভালো — একথার অর্থ কি ?

ছ) 'যথোচিত' শব্দটির অর্থ কি ?

জ) নীতিবিদ্যাকে কোন্ অর্থে বিজ্ঞান বলা হয় ?

ঝ) 'আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান' কাকে বলে ?

ঞ) 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' বলতে কি বোঝ ?

ট) নীতিবিদ্যা কি মানুষকে নীতির পথে পরিচালনা করে ?

ঠ) নীতিবিদ্যাকে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' বলার অর্থ কি ?